রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সুখবাদ, বস্তুবাদ ও চার্বাকদর্শন

সুখবাদ, বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে, ইহসুখবাদ (*হেডনিজ্‌ম্‌*) জীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ মনোভাব।[১] কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখকেই যাঁরা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে ধরেন তাঁরাও সকলে অধার্মিক বা নিরীশ্বরবাদী নন। সুখলাভের লক্ষ্যে স্থির থাকলে স্বর্গ-নরকের ধারণাকে বাতিল করতে হয় না। ইহকালেও সুখে বাঁচবে, পরকালেও সুখে বাঁচবে—এমন একটা ধারণা নিয়ে ধার্মিক লোকেও চলতে পারেন। 'ইহকাল পরকাল খোয়ানো' বলতে বোঝায় : ইহকালের অভ্যুদয় (সুখভোগ)-ও হারানো আর নিঃশ্রেয়স (পরম প্রাপ্তি, অর্থাৎ মোক্ষ)-ও না পাওয়া।[২]

এর জন্যেই অর্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহ দিতে কৃষ্ণ বলেছিলেন :

> হত হ'ও যদি, স্বর্গ; জিতলেও মহীভোগ করবে। অতএব হে কৌন্তেয়, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় (স্থিরসংকল্প) হ'য়ে ওঠ। সেজন্য সুখদুঃখ লাভ-অলাভ জয়-অজয় সমান জ্ঞান করে যুদ্ধে নিযুক্ত হও; এরূপ করলে পাপগ্রস্ত হবে না।[৩]

রাজশেখর বসু ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

> যুদ্ধের বিরুদ্ধে অর্জুন নানাপ্রকার লোকপ্রচলিত আপত্তি তুললেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যেন উপহাস ক'রে—'প্রহসন ইব'—প্রথমে সাংখ্যসন্ন্যাসিগণের মামুলী কথা—আত্মার অবিনাশিতা ইত্যাদি বোঝালেন। তারপর ক্ষত্রিয়ধর্মের কর্তব্য, লোকনিন্দার ভয়, রাজ্য বা স্বর্গলাভ ইত্যাদি সাধারণ যুক্তির অবতারণা করলেন (২১)।

গোটা বিষয়টিকে রাজশেখর বসু কী চোখে দেখেছেন তাঁর শব্দবাছাই থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। 'মামুলী কথা' ও 'সাধারণ যুক্তি' বললে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ বা *গীতা* সম্পর্কে শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ পায় না। *গীতা*-র অন্য কোনো ভাষ্যকার, মায় বঙ্কিমচন্দ্র এমন অবজ্ঞার ভাব দেখান নি, যেমন দেখিয়েছেন রাজশেখর বসু।

রাজশেখর বসুর কথাগুলি কিন্তু মোক্ষম। আত্মার অবিনাশিতা নিয়ে যতই বলা হোক, অর্জুনের চিঁড়ে তাতে ভিজছে না। অগত্যা সাদাসাপ্‌টা লোভ দেখাতে হয় : একদিকে পৃথিবীর ধন-ঐশ্বর্য ভোগ, অন্যদিকে স্বর্গসুখ। বাঁচো বা মরো, দুদিকেই লাভ ষোলো আনা।

এর সঙ্গে আরও একটি বিষয় খেয়াল করার আছে। *গীতা* ২।৩৯ থেকে গীতাধর্মবিবৃতি শুরু হয়। তার সঙ্গে আসে সাংখ্যযোগ ছাড়াও বেদবাদরত (যাঁরা কেবল বেদ-এর কথা বলেন) লোকদের প্রসঙ্গ। এঁদের খারিজ করে কৃষ্ণ সাফ বলে দেন :

> সর্বদিকে জলপ্লাবন হলে জলাশয়ের যে প্রয়োজন, জ্ঞানী ব্রহ্মনিষ্ঠের (ব্রাহ্মণস্য বিজানতহ) সর্ববেদে সেই প্রয়োজন।
>
> *গীতা* ২।৪৬

শেষ 'প্রয়োজন'-এর পাশে বন্ধনীর মধ্যে রাজশেখর বসু এর সরল মানেটি বলে দিয়েছেন : 'অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজন নেই'। কৃষ্ণ এবার চতুর্বেদ-কেও বাতিল করে দিয়ে সবার ওপরে নিষ্কাম কর্মর মহিমা বোঝাবেন। ২।৪৭-৫৩ য় তারই ব্যাখ্যান চলতে থাকে।

গীতা-কারের বাস্তববুদ্ধি তারিফ করার মতো। প্রথমে জ্ঞানের কথা (সাংখ্য), তারপর অখ্যাতির ভয়, তারও পরে জয়ের পুরস্কার, আর সবশেষে ব্রহ্মজ্ঞান (নিষ্কাম কর্ম)—এমন দফায় দফায়, ধাপে ধাপে অর্জুনকে যুদ্ধে নাবানো হয়েছে। কার ক্ষেত্রে কোন্ ওষুধ খাটবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং সব রকমের ব্যবস্থা রাখাই ভালো। মরলে অক্ষয় স্বর্গলাভ, জিতলে গোটা পৃথিবী ভোগ—এ যদি সুখবাদ না হয়, তাহলে সুখবাদ কী?

তার মানে, হিন্দুর কাছে বেদ-এর পরেই যার স্থান সেই *শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা*-য় ইহলোক-পরলোক মিলিয়ে সুখের হাতছানি দেওয়া হয় : শুধু পরলোকে স্বর্গলাভ নয়, ইহলোকের সুখসম্পদ ভোগের লোভও বাদ পড়ে না।

সুখবাদ-এর আলোচনায় যাওয়ার আগে আর-একটি কথা বলে নিই। *গীতা*-কারের বাস্তববুদ্ধির আরও একটি নমুনা দেওয়া যাক। অর্জুনকে কৃষ্ণ বললেন : চার ধরণের সুকৃতিশালী মানুষ আমায় ভজনা করে—আর্ত (বিপদ্‌গ্রস্ত), জিজ্ঞাসু (তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু), অর্থার্থী (অর্থ-অভিলাষী) ও জ্ঞানী (যার জ্ঞান লাভ হয়েছে) (৭।১৬)। পরের শ্লোক থেকে জানা যায় : শুধু জ্ঞানী হলেই হবে না, একভক্তি (একমাত্র কৃষ্ণর প্রতিই ভক্তিমান) হতে হবে। অবশ্যই এই ধরণের একভক্তি জ্ঞানীই কৃষ্ণর সবচেয়ে প্রিয়। কিন্তু তেমন লোক আর ক জন? জ্ঞানীর চেয়ে অজ্ঞানীই বেশি। কৃষ্ণ কিন্তু তাঁদেরও অবজ্ঞা করেন না। আর্ত আর অর্থার্থীরা জ্ঞানী তো ননই, এমনকি জিজ্ঞাসুও নন। কৃষ্ণ কিন্তু তাঁদেরও ফিরিয়ে দেন না। বিপদে পড়লে বা টাকার দরকার হলে লোকে আর কার কাছে যাবেন, তাঁর কাছেই তো আসবেন। কৃষ্ণ সম্পর্কে কৃষ্ণ বলেন : ভক্ত বলেই এঁরা সকলে উদার (মহান)। সুতরাং ইহসুখপ্রার্থীকে কোনোভাবেই বঞ্চিত করা হচ্ছে না।

ভাববাদী ধর্মদর্শনের সঙ্গে সুখবাদ-এর এমন পরিষ্কার যোগ থাকা সত্ত্বেও সাধারণের মধ্যে একটি সংস্কার চালু আছে। সেটি এই : সুখবাদ আর বস্তুবাদ হাত ধরাধরি করে চলে। অথচ দার্শনিক বিচারে দুটিকে কখনোই এক বঁড়শিতে গাঁথা যায় না। ভাববাদীরাও দিব্যি সুখবাদী হন; অন্যদিকে, কোনো কোনো বস্তুবাদী ভোগ আর ত্যাগের মাঝামাঝি পথ বেছে নেন। ন্যূনতম চাহিদা মেটানো আর বিলাসিতা—এই দুই প্রান্ত-র মাঝখানে অনেকটা জায়গা থাকে।

চূড়ান্ত ত্যাগ ও রাশছাড়া ভোগ—এ দু-এর কোনোটিকেই প্রশ্রয় না-দিয়ে যুক্তিবাদী মানুষ স্বচ্ছন্দে বাঁচার পথ বেছে নিতে পারেন।

বস্তুবাদ ও সুখবাদ-এর যোগ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাটি আপনা থেকে গজায় নি। বস্তুবাদ-এর প্রতিপক্ষ সুকৌশলে এটি চালু করেছেন। শুধু ভারতে নয়, সব জায়গায়। যেমন, এপিকিউরাস (৩৪১-২৭০ খ্রিপূ)। গ্রীস-এর অন্তর্গত সামোস বলে একটি দ্বীপে তিনি থাকতেন, সেখান থেকে তিনি চলে আসেন এথেন্স্-এ। নিজের অনুগামীদের নিয়ে, সবার আড়ালে থেকে তিনি গড়ে তোলেন তাঁর গোষ্ঠী, তার নাম ছিল বাগান। এপিকিউরাস-এর স্বাস্থ্য ভালো ছিল না; গুরুপাক খাবার বা পানীয় তাঁর সইত না। সাধারণত তিনি খেতেন সাদা রুটি, উৎসব পরবের দিনে সেই সঙ্গে একটু পনির। তবু লাতিন কবি হোরেস (৬৫-০৮ খ্রিপূ) বলেন 'এপিকিউরীয় খোঁয়াড়'-এর কথা। ইংরিজিতে তো বটেই, অন্যান্য ইওরোপীয় ভাষাতেও *এপিকিউর* ও *এপিকিউরিআন* বলতে বোঝায় 'ভালো খাদ্য ও পানীয়-য় যিনি বিশেষ সুখ পান[৪]।'

একজন রুগ্‌ণ মানুষের নামে এমন অপবাদ চাপল কেন? তার কারণ : এপিকিউরাস ছিলেন বস্তুবাদী দার্শনিক, পরমাণুবাদ-এর প্রচারক। তাঁর দর্শনচিন্তায় অবশ্য দেবতাদেরও জায়গা ছিল, যদিও তাঁরা থাকেন চাঁদ আর পৃথিবীর মাঝামাঝি কোনো এক জায়গায়; মানুষের সুখ-দুঃখের ব্যাপারে তাঁদের কোনো হাত নেই। তাঁরা শুধুই দর্শক, বিধাতা নন।[৫]

এপিকিউরাস কি সুখের কথা বলেন নি? নিশ্চয়ই বলেছিলেন। কিন্তু সুখ বলতে তিনি কী বোঝেন সেটিও পরিষ্কার করে লেখা আছে তাঁর একটি চিঠিতে।[৬] অসংযত পানভোজন নয়, মননচর্চার সুখকেই তিনি আসল সুখ বলে মনে করতেন। তবু, সেকথা যেন এপিকিউরাস-বিরোধী নিন্দুকদের চোখে পড়ে নি, কানেও পৌঁছয় নি।

খ্রিপূ ছয়/পাঁচ শতকের এক ভারতীয় দার্শনিক, অজিত কেশকম্বলী (পালিতে, কেসকম্বল)-কেও একই অপপ্রচারের বলি হতে হয়েছে। তিনি ছিলেন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পক্ষপাতী; চুল দিয়ে তৈরি একটি কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। কোনো সুখভোগের সম্ভাবনাই তাঁর জীবনযাত্রায় ছিল না। তবু জৈন রচনায় তাঁর অনুগামীদের ঐহিক ভোগে নিরত অবস্থায় দেখানো হয়েছে।[৭]

চার্বাকরা ভারতে দেখা দিয়েছেন অজিত কেশকম্বলীর অনেক পরে। দার্শনিক প্রসঙ্গে আট শতকের আগে 'চার্বাক' শব্দটিই পাওয়া যায় না। ধরেই নেওয়া হয় : এঁরা ছিলেন স্বঘোষিত সুখবাদী। তাঁদের নামে প্রচলিত একটি শ্লোকে বলা হয়েছে : 'যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে।'[৮] সুতরাং চার্বাকমত নির্ঘাত সুখবাদ-এর পোষক। ধার করে ঘি খাওয়ার কথাটা যে সায়ণমাধব-এর কারসাজি—এই ঘটনাটি যাঁরা জানেন ও বোঝেন তাঁরাও তাই ধন্দে পড়েন : ঐ পাদটিকে (একটি শ্লোকের চারভাগের একভাগ) অপকীর্তি বলে স্বীকার করলেও 'সুখে থাকা'-র পরামর্শটি তো থেকেই যাচ্ছে।[৯]

এই ধরণের অস্বস্তিবোধের পেছনে আছে দুটি কারণ : (এক) ত্যাগবাদ-এর মহিমা সম্পর্কে অবাস্তব ধারণা, কৃচ্ছ্রসাধনকেই জীবনযাত্রার আদর্শ বলে মনে করা, আর (দুই) আলোচ্য শ্লোকটির প্রসঙ্গ সম্পর্কে বোধের অভাব। প্রথমটি নিয়ে *কমিউনিস্ট ইশতেহার*-এ মার্কস-এঙ্গেলস অনেকখানি আলোচনা করেছেন।[১০] এখানে আবার নতুন করে একই কথা বলার দরকার

নেই। মার্কস-এঙ্গেলস-এর সিদ্ধান্ত ছিল : 'তপস্বী-মার্কা কমিউনিজম'-এর ধারণা কোনো কাজে লাগে না। এই স্পষ্ট সিদ্ধান্তের সঙ্গে যোগ করা যায় : ভারতের মতো দেশে সংসার ত্যাগী সাধু-ফকিরদের খাতির আর গাঁধিবাদ প্রচারের ফলে উদ্দেশ্য-র চেয়ে উপায় বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে কয়েকজন লোকের যেচে কষ্টস্বীকার (পরিস্থিতির চাপে নয়) সত্যিই কি কোনো কাজে দেয়? তেমন তপস্বী-মার্কা সংসারীদের দেখে সত্যিই কি গোটা সমাজ উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তাঁদের জীবনযাত্রা অনুসরণ করে? গত কয়েক হাজার বছরের মানবসভ্যতার ইতিহাসে তেমন ঘটনার নমুনা নেই। এই ধরণের মানুষরা নিজেদের মতো করে বাঁচেন ও মরেন—সমকালের উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পদ বাঁটোয়ারায় তাঁদের জীবনযাত্রার কোনো ছাপ পড়ে না।

চার্বাকরা যদি সুখে থাকার কথা বলেও থাকেন, তাতে অন্যায়ের কিছু নেই। কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ সারা জীবন দুঃখে কাটাতে চান না। দুঃখকে এড়ানো যায় না বলেই যত সমস্যা। কিন্তু যেচে দুঃখবাদী হওয়াও মানসিক সুস্থতার প্রমাণ নয়, বরং বিকার।

এবার দ্বিতীয় কথা। যে শ্লোকটিতে সুখে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তার মূলপাঠ ছিল এই :

> যতদিন বাঁচবে, সুখে বাঁচবে; মৃত্যুর অগোচর কিছু নেই। ছাই-হয়ে-যাওয়া দেহ আবার কোথায় (বা, কোথা থেকে) ফিরে আসে?[১১]

শ্লোকটির মূল ঝোঁক পুনর্জন্মবাদ-এর বিরুদ্ধে। অমরত্বর আকাঙ্ক্ষা ও স্বর্গসুখ লাভের বাসনা যে বৃথা—এই দিকটিই জোর গলায় ঘোষণা করা হয়েছে। সুখ পেতে হলে বেঁচে থাকতেই তা পেতে হবে—এই হলো মূল বক্তব্য। তার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে : সবাইকেই মরতে হবে, আর মরার পরে স্বর্গ বা পুনর্জন্ম বলে কিছু হয় না। অতএব, ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বর্তমান সুখকে মুলতুবি রাখলে নিজেরই ক্ষতি।

অন্য একটি দিক দিয়ে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। বস্তুবাদ-এর উল্‌টো পিঠে আছে ভাববাদ; সুখবাদ-এর ক্ষেত্রে ত্যাগবাদ বা দুঃখবাদ। এখন দেখুন : ভাববাদী হলেই যে কেউ দুঃখবাদী বা ত্যাগবাদী হন এমন তো নয়। ইহকালের সঙ্গে সঙ্গে পরকালের সুখ ভাববাদীদের একটি বড় ভরসার জায়গা। আর মোক্ষলাভ হলো সব দুঃখ থেকে রেহাই পাওয়া। জন্মালেই দুঃখ পেতে হবে—একথা মানলে জন্ম-জন্মান্তরে দুঃখ পেয়ে চলাই মানুষের নিয়তি। তার বদলে, যদি পুনর্জন্ম না হয়, তাহলেই সব দুঃখর শেষ।

ভাববাদীরা অবশ্যই মনে করেন : পুনর্জন্মর চক্কর থেকে বেরুতে পারলে তবেই অক্ষয় স্বর্গবাস। এটি একই সঙ্গে লোভ জাগানো ও সান্ত্বনা পাওয়ার উপযুক্ত খুড়োর কল : বর্তমানের যাবতীয় বঞ্চনা ও দুর্দশার প্রতিকার না-খুঁজে মুক্তির সাধনায় মানুষকে আত্মনিয়োগ করার ডাক।

চার্বাকরা এমন কোনো অলীক সুখের ভরসা দেন নি। উল্‌টে তাঁরা মানুষকে সাবধান করে দিয়েছেন : পরকালের আশায় থাকলে ইহকালে আর কিছুই জুটবে না। ইহকালের চেয়ে পরকালকে বড় করে দেখা একটা বিরাট ভুল। তার কারণ : মৃত্যুতেই জীবনের শেষ। পরকাল পরলোক স্বর্গ নরক ইত্যাদি কিছুই নেই।[১২]

এই সিদ্ধান্ত মানুষকে জানানোর প্রসঙ্গেই সুখে বাঁচার কথা এসেছে। এটি তাই শ্লোকের মূল বিষয় নয়, বরং তার সহচর।

কয়েক শতক জুড়ে ভারতের প্রধান দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিস্তর তর্কবিতর্ক হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো বিষয় হলো পরলোক আছে না নেই। *কঠ উপনিষদ্*-এর যম-নচিকেতা সংবাদ তার প্রথম নজির। পরলোক ও পুনর্মৃত্যু—ভাববাদ-এর এই হলো দুই প্রধান খুঁটি। এই দুটি ধারণাকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তার জন্যেই মৃত্যুর দেবতা যমরাজকে আপ্তপুরুষ খাড়া করা হয়। বিচিকিৎসু (সংশয়ী) বালক নচিকেতাকে তিনি আশ্বস্ত করেন : হ্যাঁ, পরলোক আছে (১।১।২০, ১।২।৬)। কিন্তু সেকথা বলার আগে বিস্তর ধানাই পানাই চলে। ব্যাপারটি এতই গুহ্য ও রহস্যময় যে দেবতারাও নাকি এ ব্যাপারে ধন্দে ছিলেন (১।১।২১)। পরলোক আছে না নেই—এই সংশয় থেকেই ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদ বনাম বস্তুবাদ-এর বিরোধ শুরু। অন্য সব প্রসঙ্গ পরে একে একে যোগ হয়েছে। কিন্তু সুখ-দুঃখর কথা ভারতের দর্শন আলোচনায় কখনোই বড় হয়ে দেখা দেয় নি। শুধু চার্বাকদর্শনের ক্ষেত্রেই সুখবাদ-এর প্রসঙ্গ তুলে জল ঘোলা করা হয়। সাংখ্য সম্পর্কেও এমন একটি অভিযোগ ছিল।[১৩] কিন্তু বিরোধীপক্ষ এই নিয়ে বাজার গরম করার চেষ্টা করে নি, করা হয়েছে শুধু চার্বাকদর্শনের ক্ষেত্রে। আর সে প্রতাপের মহিমা এমনই যে বস্তুবাদ-এর সমর্থকরাও সেটি মেনে নিয়েছেন। তার একটা নমুনা দিই।

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর জন্মশতবার্ষিকী (১৯৯৪) উপলক্ষ্যে তাঁর *চার্বাক ফিলজফি* বইটি আবার ছাপা হয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (১৯৯৬)। পদাধিকার বলে তার একটি ভূমিকা (প্রাক্‌কথন) লেখেন তদানীন্তন উপাচার্য। বস্তুবাদ-এর তিনি ঘোর সমর্থক, আর সেই কারণে চার্বাকদর্শনেরও অনুরাগী। কিন্তু ভূমিকার গোড়াতেই তিনি একটি বিশাল *ফো পা* (faux pas) করেছেন : '[T]he Charvaka or Barhaspatya philosophy, now accepted as a valid, although much maligned, member of the set of six systems of Indian philosophy....'[১৪]

একমাত্র হরিভদ্র-র *ষড়দর্শনসমুচ্চয়* ছাড়া আর কোথাও ষড়দর্শনের তালিকায় চার্বাকের নাম আসে না। ষড়দর্শন বলতে বোঝায় বেদপন্থী ছটি আস্তিক দর্শন : সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত। নাস্তিক দর্শনের সংখ্যাকেও একই রাখার জন্যে কেউ কেউ বৌদ্ধদর্শনের চারটি সম্প্রদায়কে আলাদা করে নাস্তিক ষড়দর্শনের একটি সমান্তরাল তালিকা করেছেন : যোগাচার, মধ্যমক (মাধ্যমিক), বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, জৈন, ও চার্বাক।[১৫] সুতরাং উপাচার্যর কথাটি ডাহা ভুল। কিন্তু এখানেই *ফো পা* থামে নি। ভূমিকার শেষ অংশে চার্বাকের সুখ্যাত করে সেই উপাচার্য লিখেছেন : 'A no-nonsense and businesslike philosophy like his (চার্বাক-এর), minus its hedonistic excesses (which may well be interpolations by its antagonists), is a near thing to the philosophy that works, the philosophy that explains things as its attempts at changing them.'[১৬]

ঐ উপাচার্যটি জানতেন না : চার্বাকদের নামে প্রচলিত সূত্রগুলির কোনোটিতেই সুখবাদ বা তার বাড়াবাড়ির কথা নেই। চার্বাকদর্শনের ঘোর শত্রুও তেমন কোনো সূত্র উল্লেখ করেন

নি। সুখবাদ-এর অভিযোগ ওঠে একটিমাত্র শ্লোক প্রসঙ্গে (যেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি)। সেই শ্লোকটি বহু প্রাচীন, *বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণ* (১।১০৮।১৮-১৯)-এ পরলোক-এ অবিশ্বাসী এক রাজার মুখ দিয়ে সেটি বলানো হয়েছে। পুরাণটি সম্ভবত ৪০০-৫০০ খ্রি.-র মধ্যে লেখা। খ্রি. আট শতক থেকেই এই শ্লোক বা তার দু-একটি পাদ অনেক দার্শনিকই উদ্ধৃত করেছেন।[১৭] সুতরাং প্রক্ষেপ-এর প্রশ্নই ওঠে না। বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান, যজ্ঞ, দান (দক্ষিণা), দেবতা, ঋষি কিছুই নেই; ধূর্তরা মোহগ্রস্তদের টাকাকড়ি হাতানোর জন্যে এইসব আছে এমন বলে থাকেন। এখানেও বিতর্কর মূল বিষয় : ধর্মাচরণ করা বা না-করা।

শোনা কথার ভরসায় যে-কোনো বিষয়ে যে-কোনো বই-এর ভূমিকা লিখতে গেলে এমন *ফো পা* হবেই। পদাধিকারবলে মানুষকে অনেক কিছুই করতে হয়; বই-এর ভূমিকা লেখা তার একটি। কিন্তু সেটি আসল কথা নয়। ব্যাপার হলো : চার্বাকদর্শনে সঙ্গে সুখবাদ, এমনকি তার বাড়াবাড়িও কীভাবে লোকের মনে গেঁথে গেছে—ঐ ভূমিকাটি তারই এক করুণ দৃষ্টান্ত।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. দর্শনের যে-কোনো অভিধান (যেমন ব্ল্যাকবার্ন) ও বিশ্বকোষে *হেডনিজ্‌ম্*-এর কমবেশি বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যাবে। উইকিপিডিআ দিয়েও শুরু করা যায়।

২. মোক্ষ-র ধারণাটি অবশ্য খুবই জটিল : এক-এক সম্প্রদায় এক-একভাবে তার ব্যাখ্যা করেন। ন্যায়-বৈশেষিক মতে বেঁচে থাকতেই মুক্তি পাওয়ার পর সেই মুক্তপুরুষ পাথর ঢ্যালা ইত্যাদির মতো জড়বস্তুতে পরিণত হন। জনৈক ভক্তবৈষ্ণব চটে গিয়ে লিখেছিলেন :

বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহম্।
ন তু বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন।।

'বরং আমি বৃন্দাবনে শৃগাল হইব; কিন্তু আমি বৈশেষিক-দর্শনোক্ত মুক্তি কখনও প্রার্থনা করি না।'

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ১৯৭৮ পৃ. ৮-৯ টী.।

৩. অনু. রাজশেখর বসু ১৩৯৫ ব.।

৪. এপিকিউরাস ও তাঁর মতামত সম্পর্কে জানার জন্যে দিওগেনেস লাএরতিউস, খণ্ড ২, ১০।১২৯, ১৩১-৩২; রাসেল ১৯৫৬ পৃ. ১৯৯। হোরেস-এর উক্তিটি আছে তাঁর *পত্রকবিতা* ১:৪।১৬-য়। এছাড়া ম্যানসের ও ব্ল্যাকবার্ন-এর অভিধান দুটিতে 'এপিকিউরাস' দ্র.।

৫. রোজেনথাল ও ইউদিন 'লুক্রেতিউস' দ্র.।

৬. দিওগেনেস লাএরতিউস (টী. ৪ দ্র.)।

৭. *সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র* ২।১।১৭। অজিত কেশকম্বলী-র দর্শনচিন্তার সারাৎসার পাওয়া যায় 'সামঞ্ঞফলসুত্ত' ('শ্রামণ্যফলসূত্র')-য় দ্র. *দীঘনিকায়* ২ : ৪৮।

৮. অন্যত্র এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : ২০১০, পৃ. ২৬১-৬৪ ও রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ২০০৯/২০১১ পৃ. ২০১-০৬ দ্র.।

৯. টী. ৮ দ্র.।

১০. *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো*, অধ্যায় ৩(৩) পৃ. ৬৭ ও ২৩২-৩৩ দ্র.।

১১. টী. ৮ দ্র.।

১২. যে কটি চার্বাকসূত্র একাধিক উৎসে পাওয়া যায় তার মধ্যে দুটি হলো : 'পরলোক

অসিদ্ধ—প্রমাণের অভাবে' আর 'পরলোকবাসী (পরলোকের বাসিন্দা অর্থাৎ আত্মা) না-থাকায় পরলোক নেই।' রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ২০১০ পৃ. ৫৪-৫৫ সূত্র ৪।১-২। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ও মামোরু নামাই-এর চার্বাকসূত্র সঙ্কলনে আরও একটি বচন পাওয়া যায় : 'মরণই অপবর্গ' (শাস্ত্রী সূত্র ৮, ৩০; নামাই A 12)। কিন্তু এই 'সূত্র'টি কতটা খাঁটি সে-নিয়ে সন্দেহ আছে। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ২০১০ পৃ. ৫৬ দ্র.।

১৩. *সাংখ্যকারিকা*-র একটি বৃত্তি (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ)-তে মাধব সেটি উদ্ধৃত করেছেন :

> সর্বদা হাসো, পান করো, খেলা করো, আনন্দ করো, সববিষয় উপভোগ করো,
> ভয় কোরো না। যদি তোমার কপিলমত জানা থাকে, তাহলে তুমি মোক্ষও পাবে,
> সুখও পাবে।

সাংখ্যকারিকা ৩৭ প্রসঙ্গে, পৃ. ১৪৯।

১৪. শাস্ত্রী ১৯৯৬-এর ভূমিকা [পৃ. ৫]।

১৫. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাস্তিক ২ দ্র.।

১৬. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, টী. ১৪ ভূমিকা [পৃ. ৬]।

১৭. বিশদ আলোচনার জন্যে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : ২০১০, অধ্যায় ৩১ দ্র.।

উল্লেখপঞ্জি

দীঘনিকায়, জগদীশ কাশ্যপ সম্পা. পটনা : পালি পাবলিকেশন বোর্ড, ১৯৫৮।

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, *ন্যায়পরিচয়*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৮।

রাজশেখর বসু, (অনূ.)। *শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা*, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স, ১৩৯৫।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *চার্বাকচর্চা*, সদেশ, ২০১০।

সাংখ্যকারিকা মাঠর বৃত্তি সমেত। স্বামী দিবাকরানন্দ। মন্দিরবাজার, ২৪ পরগণা : জগন্নাথ বর্মণ, ১৩৭৫ ব.।

সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র, দিল্লী : মোতিলাল বনারসী দাস ইন্ডোলজিকাল ট্রাস্ট, ১৯৭৮।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, নয়া দিল্লী : সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৬৭।

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, *চার্বাক ফিলসফি*, কলকাতা : রবীন্দ্র-ভারতী ইউনিভার্সিটি, পবিত্র সরকারের ভূমিকা, ১৯৯৬।

বার্ট্রান্ড রাসেল, দ রোড টু হ্যাপিনেস, *পোরট্রেট্‌স ফ্রম মেমরি অ্যান্ড আদার এসেজ*, লন্ডন : জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন, ১৯৫৬।

এম এইচ ম্যানসের, *দ ওয়র্ডসওয়র্থ ডিকশনর অফ এপনিম্‌স*, ওয়্যার : ওয়ার্ডসওয়র্থ এডিশন্‌স্, প্রকাশসাল নেই।

মার্কস-এঙ্গল্‌স, *দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো*, ডি. রিয়াজনফ সম্পা., কলকাতা : র‍্যাডিকাল বুক ক্লাব, ১৯৭২।

এম. রোজেনথাল অ্যান্ড পি. ইউদিন, *আ ডিকশনারি অফ ফিলজফি*, মস্কো : প্রগ্রেস পাবলিশার্স, ১৯৬৭।

দিওগোনেস লাএরতিউস, *লাইভ্‌স্ অফ এমিনেন্ট ফিলজফার্স্*, লন্ডন : উইলিয়ম হাইন্ডমান, খন্ড ১-২, ১৯২৫।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *স্টাডিজ অন দ চার্বাক লোকায়ত*, ফিরেনৎসে (ফ্লোরেন্স) : সোচিএতা এদিত্রিচে ফিওরেনতিনা, ২০০৯; লন্ডন : অ্যানথেম প্রেস, ২০১১।

সাইমন ব্ল্যাকবার্ন; *দ অক্স্‌ফোর্ড ডিকশনারি অফ ফিলজফি*, অক্সফোর্ড : অক্স্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৪।

হোরেস, *এপিসল্‌স*, লন্ডন : উইলিয়ম হাইনেমান ১৯২৬।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (carvaka_rkb@yahoo.com) ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। দর্শন, সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে চর্চা করছেন দীর্ঘ দিন।